জীবনে যা দেখলাম

নবম খণ্ড (১৯৯৬-২০১১)

[৯ খণ্ডে সমাপ্ত]

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন - ঢাকা

শুকরিয়া

আত্মজীবনী হিসেবে ৯ খণ্ডে প্রসারিত লেখা সম্পন্ন করার তাওফীক যিনি দিলেন, সে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সর্বপ্রথম শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

মরহুম জাতীয় অধ্যাপক মনীষী সৈয়দ আলী আহসানসহ অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রেরণায় আত্মজীবনী লেখার সিদ্ধান্ত নেই। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর আলী আহসান সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাতে এ ব্যাপারে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তাঁর প্রতি শুকরিয়া জানানো কর্তব্য মনে করি।

ছাত্রজীবন থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভাষাবিদ পণ্ডিত প্রফেসর ড. কাজী দীন মুহম্মদ ও এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি আল মাহমুদ তাদের অভিমত প্রকাশ করে আমাকে শুকরিয়া জানাতে বাধ্য করেছেন। এ তিনজনের অমূল্য অভিমত প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকে (কোনো জটিলতা না থাকলে) প্রতি জুমু'আ বারই দৈনিক সংগ্রামে ধারাবাহিকভাবে আমার এ লেখা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল আসাদকে এজন্য শুকরিয়া জানাই।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর জনাব মকবুল আহমদ আমার এ লেখা পড়ার জন্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আমাকে কৃজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

বিভিন্নভাবে আমার এ লেখার পাঠকপ্রিয়তার কথা জানতে পেরে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। যে পাঠকদের মাধ্যমে তা জানা গেছে তাদের প্রতিও শুকরিয়া জানাই।

আমার লেখার পাঠকদের মধ্যে যারা ফোনে বা চিঠির মাধ্যমে তথ্যগত সংশোধনীতে সাহায্য করেছেন তাদেরকে বিশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

কামিয়াব প্রকাশন-এর স্বত্বাধিকারী একান্ত স্নেহভাজন মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন যে যত্ন ও আন্তরিকতার সাথে এ লেখা প্রকাশ করেছেন, তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। শুকরিয়া জানিয়ে তাকে লজ্জা দিতে চাই না। তার জন্য আন্তরিকভাবে দু'আ করি।

সবশেষে, আমার প্রতিটি লেখা প্রকাশককে দেওয়ার পূর্বে তা পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনের পরামর্শ দিয়ে এবং পরে অত্যন্ত যত্নের সাথে প্রুফ দেখে আমার একান্ত সচিব অনুজ-প্রতিম নাজমুল হক বিরাট খিদমত করেছেন। তার এ মূল্যবান খিদমতের জন্য অবশ্যই শুকরিয়া পাওয়ার অধিকারী।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ী ভাই-বোনদের নিকট দু'আ চাই, যেন আমার আত্মজীবনীমূলক লেখাটি তাদের জন্য সুখপাঠ্য ও শিক্ষণীয় বিবেচিত হয়।

গোলাম আযম
সেপ্টেম্বর, ২০১০

সূচিপত্র

পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বিজয় ১৭
গণতন্ত্রই বাংলাদেশের ভিত্তি ১৭
বাংলাদেশে প্রথম গণতন্ত্র হত্যা ১৮
গণতান্ত্রিক পন্থা রুদ্ধ হয়ে গেল ১৮
জাতীয় সংসদে এমন স্বৈরশাসন কেমন করে অনুমোদন পেল? ১৯
স্বৈরশাসনের অনিবার্য পরিণাম ১৯
মুজিব হত্যাকারীদের অদ্ভুত আন্তরিকতা ২০
মুজিব হত্যার প্রতিক্রিয়া ২১
১৫ আগস্ট কি শোক দিবস? ২২
জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ২৩
জাতীয় ঐক্যের প্রচেষ্টা ২৫
স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের ধুয়া ২৬
ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে আওয়ামীকরণ প্রচেষ্টা ২৭
ইসলামি ফাউন্ডেশনে সংস্কার সাধন ২৮
সিরাতুন্নবী পরিভাষা চালু করার ইতিহাস ২৮
কারাগারে চার নেতার হত্যা ৩০
মুজিব হত্যা কি এ জাতীয় অপরাধ? ৩০
বাকশালী শাসনব্যবস্থা ৩১
এ ব্যবস্থা চালু হলে ৩২
'৭৫-এর ১৫ আগস্ট কি শোক দিবস? ৩২
আগস্ট বিপ্লবের সুফল ৩৩
শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্বে মুজিব হত্যার বিচার দাবি কেন করেননি? ৩৩
মুজিব হত্যার বিচারব্যবস্থা ৩৪
হাইকোর্টে আপিল হলো ৩৫
সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে মামলার হাল ৩৫
বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট ৩৬
বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ষোলো বছর ৩৭
গণতন্ত্রে পুনরায় সংকট ৩৭
২০০৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন ব্যর্থ হলো কেন? ৩৮

মক্কা-মদীনায় অবস্থান ৮০
একা কোথাও যেতে পারি না ৮১
আমাদের বংশে সবারই প্রমোশন হয়ে গেল ৮২
সুলাইমানকে লেখা আমার চিঠি ৮৩
চিঠির অনুবাদ ৮৪
একান্ত আপনজনকে হারালাম ৮৪
আমার সাথে সম্পর্ক ৮৫
আমার ছাত্র ভায়রা হয়ে গেল ৮৬
জামায়াত নেতা হিসেবে ৮৭
মানুষ হিসেবে ৮৮
তাঁর জনপ্রিয়তা ৮৮
ঢাকায় জানাযা ৮৮
বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকটের মূলে ৮৯
এ দেশে ইংরেজ শাসন ৯০
ইংরেজ শাসন কেমন করে এত দীর্ঘায়িত হলো? ৯০
ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন ৯১
স্বাধীনতা দাবি ৯১
১৯৪৬ সালের নির্বাচন ৯২
পাকিস্তান আন্দোলনে দু প্রধান নেতা ৯২
বঙ্গদেশে মুসলিম লীগে দুটো উপদল ৯৩
১৯৫৪ সালের নির্বাচন ৯৩
আওয়ামী মুসলিম লীগের আদর্শিক অধঃপতন ৯৪
ইসলামী আদর্শের প্রতি মুসলিম লীগের বিশ্বাসঘাতকতা ৯৫
১৯৭০-এর নির্বাচন ৯৫
বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য ৯৬
ফিল্ড মার্শাল মানেক শ'র বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য ৯৭
সরকার আওয়ামী লীগের এজেন্ডাই বাস্তবায়ন করছে ৯৭
আওয়ামী লীগের আদর্শিক অধঃপতনই রাজনৈতিক সংকটের মূল ৯৯
রাজনৈতিক সংকট থেকে মুক্তির উপায় ৯৯
গণতন্ত্র পুনর্বহাল করার একমাত্র উপায় নির্বাচন ১০০
সংকট উত্তরণের একমাত্র পথ ১০০

৩৩৮.

পাকিস্তানে গণতন্ত্রের বিজয়

দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র ভারত ছাড়া সব কয়টি দেশেই সশস্ত্রবাহিনী বারবার গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে সামরিক স্বৈরশাসন জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। মায়ানমারে (বার্মা) তো একটানাই সামরিক জান্তা ক্ষমতাসীন রয়েছে। পাকিস্তানের ৬০ বছর বয়সে তিন দশকেরও বেশি সময় সামরিক স্বৈরশাসন চলেছে। জেনারেল আইয়ূব খান, ইয়াহিয়া খান, জিয়াউল হক ও পারভেজ মুশাররফ নায়কের ভূমিকা পালন করেছেন।

আইয়ুব খান গণ-আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করলেও পারভেজ মুশাররফের মতো এত লাঞ্ছিত হননি। ইয়াহিয়া খান ১৯৭০-এর নির্বাচনের পর ব্যালটের ফলাফলকে বুলেটের সাহায্যে দাবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রের পরিণামে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার অপবাদ নিয়ে অসম্মানজনকভাবেই বিদায় হন। জিয়াউল হক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত না হলে হয়তো ইন্দোনেশিয়ার সুহার্তোর মতোই দীর্ঘকাল স্বৈরশাসন চালিয়ে যেতেন। পারভেজ মুশাররফকে যেভাবে বিদায় নিতে হয়েছে তাতে আশা করা যায় যে, সে দেশে সেনাবাহিনী অদূর ভবিষ্যতে ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা চালাবে না।

রাজনৈতিক দলগুলো যদি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সক্ষম হয়, তাহলে আর কোনো সময় হয়তো সামরিক শাসন চেপে বসতে পারবে না। গণতন্ত্রের এ বিজয়কে স্থায়িত্ব দান করা সম্ভব হবে যদি রাজনৈতিক দলসমূহ অতীত থেকে যথার্থ শিক্ষাগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। আর যদি রাজনৈতিক কোন্দল লেগেই থাকে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনগণের আস্থা হারান, তাহলে অতীতের মতো আবার সামরিক শাসন আসতে পারে।

গণতন্ত্রই বাংলাদেশের ভিত্তি

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ শেখ মজিবুর রহমানকে পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী বানানোর উদ্দেশ্যে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে তাঁর দলকে একমাত্র বিজয়ী দলের গৌরব দান করে। নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেন যে, শেখ মজিবই প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। মি. ভুট্টোর সাথে আঁতাত করে ইয়াহিয়া খান ব্যালটের সিদ্ধান্তকে বুলেট দিয়ে দাবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র না করলে পাকিস্তান থেকে এ দেশকে আলাদা করার প্রয়োজন হতো না।

জনগণের সিদ্ধান্তকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র করার ফলেই জনগণকে বাধ্য হয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

১৯৭০-এর নির্বাচিত গণ-প্রতিনিধিগণই রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করে এ নতুন রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। শাসনতন্ত্রে বিভিন্ন দিক দিয়ে যত ত্রুটিই থাকুক সরকার-কাঠামো পুর্ণরূপে গণতান্ত্রিকই ছিল। জাতীয় সংসদে শাসনতন্ত্র সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হওয়ার পর শেখ মজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এভাবে বাংলাদেশের প্রথম সরকার একটি বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক সরকার বলেই গণ্য হতে পারে।

বাংলাদেশে প্রথম গণতন্ত্র হত্যা

বাংলাদেশে প্রথম গণতন্ত্র হত্যাকারী কোনো সামরিক ব্যক্তি নয়। কলঙ্কের কথা হলো, এমন এক ব্যক্তি এ কর্মটি সম্পন্ন করেন, যিনি ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্বে সারা জীবন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন, যিনি জননেতা হিসেবে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের আনুগত্য ও হেফাযতের শপথ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তার মতো জনপ্রিয়তার কিংবদন্তি পুরুষ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের মাত্র দু' বছর পরই যে শাসনতন্ত্রের হেফাযতের শপথ নিলেন সে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রকেই বিকৃত করে একদলীয় বাকশালী শাসন চালু করেন। তিনি কেন তার ভক্ত জনগণের উপর এত অল্প সময়ের মধ্যে আস্থা হারালেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। তাহলে কি বাস্তবে তার জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল?

তিনি আক্ষেপ করে তাঁর তৈরি দলীয় বাহিনী সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'সবাই পায় সোনার খনি, আমি পেলাম চোরের খনি।'

তিনি নিঃসন্দেহে একজন যোগ্য সংগঠক ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ নেতৃত্বে যে বিশাল ও শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন তা যদি চোরের খনিতে পরিণত হয়ে থাকে তাহলে এর জন্য তিনি ছাড়া আর কেউ তো দায়ী হতে পারে না।

গণতান্ত্রিক পন্থা রুদ্ধ হয়ে গেল

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠা করাই গণতন্ত্রের প্রধান দাবি। বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাই বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাজনীতি হিসেবে গণ্য। নির্বাচিত দলীয় সরকার তার মেয়াদকালে জনগণকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম হলে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ অন্য দলকে নির্বাচিত করে। এটাই প্রচলিত গণতান্ত্রিক নীতি।

একদলীয় বাকশালী ব্যবস্থায় নির্বাচন হলে জনগণ বাধ্য হয়ে বাকশালকেই ভোট দেবে। এটাকে নির্বাচন বলা হাস্যকর। বাকশাল যাদেরকে মনোনয়ন দেবে তারাই নির্বাচিত হবে। তাহলে ভোটের কোনো দরকারই নেই। নির্বাচনী প্রহসন করেই মেয়াদ শেষে আবার বাকশালী শাসনই চালু হবে।

বাকশালী ব্যবস্থায় ৪টি দৈনিক পত্রিকা সরকারি মালিকানায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। আর সব পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকারি পত্রিকায় সবসময় সরকারের সব কাজের প্রশংসাই করা হবে। সরকারের সমালোচনা করার জন্য কোনো পত্রিকা না থাকলে জনগণ সরকারি স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না।

এ জাতীয় ব্যবস্থায় গোটা দেশ কারাগারে পরিণত হবে। জনগণ সরকারের গোলাম হয়ে নীরবে সবকিছু সহ্য করতে বাধ্য হবে। এ থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো গণতান্ত্রিক পথই থাকবে না।

জাতীয় সংসদে এমন স্বৈরশাসন কেমন করে অনুমোদন পেল?

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বাকশালী স্বৈরশাসনের পক্ষে নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্য কেমন করে সম্মতি দিলেন তা বিশ্বের মহাবিস্ময়। সংগ্রামী আওয়ামী লীগের বিপবী নেতৃবৃন্দ সহ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কেমন করে এমন চরম গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন?

জানা যায় যে, ৩০০ এমপি'র মধ্যে মাত্র দু'জন গণতন্ত্র হত্যার প্রতিবাদে সংসদ সদস্য পদ পরিত্যাগ করেন। তাঁরা হলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এজি ওসমানী ও ব্যারিস্টার মুইনুল হোসেন। তাঁরাও অবশ্য আওয়ামী লীগেরই দলীয় এমপি ছিলেন। তবে এ দুজনই মাত্র গণতন্ত্রে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী ছিলেন।

বর্তমানে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ড. কামাল হোসেন এবং ১৯৭৫ সালে কারাগারে নিহত চার জাতীয় নেতাসহ আওয়ামী লীগের সকল এমপি অন্ধভাবে গণতন্ত্র হত্যায় নেতার আনুগত্য করলেন।

উক্ত সংসদের নির্বাচন ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ৭টি আসন দয়া করে দখল করেনি। সে নির্বাচন কতটুকু 'নিরপেক্ষ' ছিল তা কারো অজানা নেই।

আওয়ামী লীগ যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হতো তাহলে এভাবে সংসদের আসনগুলো দখল করতে চাইতো না এবং বাকশালী এক দলীয় স্বৈরশাসন অনুমোদন করতে সম্মত হতো না। গণতন্ত্রের স্লোগান তাদের রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। ক্ষমতাসীন অবস্থায় কোনো কালেই এ দলটি গণতান্ত্রিক আচরণ প্রদর্শন করতে পারেনি।

স্বৈরশাসনের অনিবার্য পরিণাম

একটি গণতান্ত্রিক দেশে যদি এমন স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা হয়, যে শাসন থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অবশিষ্ট থাকে না, তাহলে এর ঐতিহাসিক পরিণাম অনিবার্য হয়ে পড়ে। তখন শক্তি প্রয়োগ করে স্বৈরশাসনের অবসান করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকে না।

বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বহাল করার জন্য শক্তি প্রয়োগ ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। জনগণের পক্ষে শক্তি প্রয়োগের কোনো সুযোগ ছিল না। সরকারবিরোধী আন্দোলন করে গণ-অভ্যুত্থানের উপায়ও ছিল না। অসহায় ও নিরুপায় জনগণকে স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত করার জন্য সামরিক বিপব ছাড়া আর কোনো পথই খোলা ছিল না।

এমন পরিস্থিতিতে দেশে দেশে সশস্ত্র বাহিনীই সাধারণত এ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন মি. ভুট্টোর স্বৈরশাসন থেকে ১৯৭৭ সালে সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু সামরিক শাসক নিজেই আবার স্বৈরশাসকে পরিণত হয়।

বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে যিনি সেনাপ্রধান ছিলেন তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা নীরবে বাকশালী স্বৈরশাসনকে মেনে নেন। কিন্তু ট্যাংক বাহিনীর কয়েকজন জুনিয়র সেনাকর্মকর্তা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। স্বৈরশাসন থেকে জনগণকে মুক্তি দেওয়ার জন্য শেখ মজিবকে হত্যা করা অপরিহার্য মনে করেন।

এটা অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে গোটা সশস্ত্র বাহিনী ও 'রক্ষী বাহিনী' নামক শেখ মুজিবের গদি-রক্ষাকারী সশস্ত্র বাহিনী থাকা সত্ত্বেও কয়েকজন জুনিয়র সেনাকর্মকর্তা এত বড় দুঃসাহস কেমন করে করলেন? যদি তারা এ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হতেন তাহলে তাদের সবাইকে কোর্ট মার্শালে জীবন দিতে হতো।

মজিব সরকারের সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা বিভাগ, শেখ মুজিবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ভারত সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং মজিব সরকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাশিয়ার গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান কেজিবি সদা তৎপর থাকা সত্ত্বেও মজিব হত্যার মতো এতো বিরাট ঘটনা সত্যিই অলৌকিক ব্যাপার।

মজিব হত্যাকারীদের অদ্ভূত আন্তরিকতা

মজিব হত্যার পরিকল্পনাকারী সেনা কর্মকর্তারা লিবিয়ার কর্নেল গাদ্দাফীর মতো সামরিক শাসন কায়েম করেননি। তারা শাসনতন্ত্রকে মুলতবি করেননি এবং জাতীয় সংসদকে বাতিল ঘোষণা করেননি। শেখ মজিব সরকারের সিনিয়র মন্ত্রী খোন্দকার মুশতাক আহমদকে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত করান। তিন সশস্ত্রবাহিনীর প্রধানগণ নতুন রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় জুনিয়র অফিসারদের সশস্ত্র বিপব সফল হয়। দেশ ও জনগণ স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পায় এবং গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত হয়।

বিপবী জুনিয়র অফিসারগণ যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এ দুঃসাহস করতেন, তাহলে তারা সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করতেন, শাসনতন্ত্র

বাতিল বা মুলতবি করতেন, জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিতেন এবং সশস্ত্রবাহিনী প্রধানদেরকে অপসারণ করতেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, দেশ ও জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তাঁরা জীবনের এত বড় ঝুঁকি নিয়ে এ অসাধ্য কাজ সমাধা করার হিম্মত দেখিয়েছেন।

মজিব হত্যার প্রতিক্রিয়া

১৯৭১ ও '৭২ সালে শেখ মুজিবের যে আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তা ছিল এবং তিনি জনগণের যে আবেগপূর্ণ ভালোবাসার অধিকারী ছিলেন, যদি এর সামান্য পরিমাণও অবশিষ্ট থাকত তাহলে সপরিবারে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরূপ প্রতিক্রিয়া কিছুটা হলেও প্রকাশ পেতো। জনগণের সামান্য সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও বাকশাল নেতৃবৃন্দ অন্তত প্রতিবাদ মিছিল বের করতেন।

জনগণ যদি সত্যিই শেখ মজিবকে জাতির পিতা হিসেবে শ্রদ্ধা করত তাহলে অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করত।

শেখ মুজিবের গদিরক্ষা বাহিনী (রক্ষীবাহিনী) যদি জনগণের সাড়া পাওয়া যাবে বলে মনে করত তাহলে অবশ্যই হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করত। হত্যাকারী ট্যাংক বাহিনীর চেয়ে অনেক বিরাট রক্ষীবাহিনী বঙ্গভবন দখল করতে চেষ্টা করত এবং হত্যাকারীদেরকে সেখান থেকে অপসারণ করত। তারা অন্তত রেডিও স্টেশন দখল করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারত।

রেডিওতে মেজর ডালিমের কণ্ঠে মজিব হত্যার সংবাদ জেনে সারা দেশে জনগণের মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, এর জলন্ত সাক্ষী ১৫ আগস্ট থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাসমূহ। দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ সে সময় প্রধান পত্রিকা ছিল। ঐ পত্রিকা দুটোতে ১৫ আগস্ট থেকে ক্রমাগত যত সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে সঠিক তথ্য জানা যাবে।

বাংলাদেশে বর্তমানে যাদের বয়স ৪৫-এর ঊর্ধ্বে তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের নিকট যদি দাবি জানানো হয় যে, আপনাদের পরিচালনায়ই জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করুন যে, মজিব হত্যার প্রতিক্রিয়ায় জনগণ শোক প্রকাশ করেছিল কি না, তাহলে কি তারা এ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন?

আমি তখন লন্ডনে ছিলাম। আমি ইস্ট লন্ডন এলাকায় অবস্থান করতাম যেখানে বাংলাদেশি প্রবাসীরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যয় বসবাস করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা দেশের জনগণের চেয়েও বেশি উৎসাহের সাথে সক্রিয় ছিলেন। দেশে তো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কারণে প্রকাশ্যে তৎপরতা চালানো সহজ ছিল না। লন্ডনে তো পরিবেশ ভিন্ন ছিল। মজিব হত্যার পর দেশে তো কেউ সামান্য প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। কিন্তু লন্ডনের পরিবেশে আওয়ামী লীগ সমর্থকরাও কেন

সামান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারলেন না তা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার। কেউ ব্যক্তিগতভাবেও শোক প্রকাশ করেছে বলে জানা যায়নি।

লন্ডনের পত্রিকায় ১৫ আগস্টের খবর যে ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল এর বিশুদ্ধ অনুবাদ থেকে জনগণের মধ্যে মজিব হত্যার প্রতিক্রিয়া জানা যায়। নিম্নে অনুবাদ পেশ করা হলো:

'১৫ আগস্ট। ঢাকায় কারফিউ জারি করা হয়। শুক্রবারের নামাযের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে দু' ঘণ্টার জন্য কারফিউ তুলে নেওয়া হয়। ঐ সময় সংগঠিত মিছিলের আকারে জনগণকে মসজিদের দিকে যেতে দেখা যায়। তাদের চোখ-মুখ, হাবভাব ও আচরণ দেখে মনে হয় যে, তারা কোনো জাতীয় উৎসব পালন করছে। রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়কে একই দৃশ্য দেখা গেল।'

লন্ডনের পত্রিকায় প্রকাশিত এ রিপোর্ট সঠিক কি না এর সাক্ষ্য তারাই দিতে পারেন যারা তখন ঢাকায় ছিলেন। আওয়ামী লীগের ৪৫ ঊর্ধ্ব সকলেই এর সাক্ষী। তাদের সাহস থাকলে কেউ বলুন যে এ রিপোর্ট সঠিক নয়।

১৫ আগস্ট কি শোক দিবস?

বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারের উপদেষ্টাগণের মধ্যে একজনও কি লন্ডনের পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট মিথ্যা বলে দাবি করতে পারবেন? তারা তো জাতীয় শোক দিবস পালন করলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যদি গোটা জাতি উল্লাস করে থাকে এবং ঐ দিনটিকে মুক্তি দিবস মনে করে থাকে তাহলে ঐ দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করা দ্বারা কি জাতিকে অপমান করা হলো না?

মজিব হত্যাকারীরা যদি ফাঁসির যোগ্য অপরাধ করে থাকেন তাহলে গোটা জাতিকেই অপরাধী সাব্যস্ত করতে হয়। '৭৫ সালে যদি জাতি শেখ মজিবকে জাতির পিতা হিসেবে শ্রদ্ধা করতো তাহলে জিয়াউর রহমানের জানাযার সময় সশস্ত্রবাহিনীর লোক ও জনগণ যেরকম শোক প্রকাশ করেছে এর চেয়ে অনেক বেশি মজিব হত্যার কারণে শোকাভিভূত হতো।

সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ এ বছর (২০০৮) ১৫ আগস্টে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে দাবি করেন যে, মজিব হত্যার জন্য যদি ফাঁসি দিতে হয় তাহলে তখনকার সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহকেই প্রথমে ফাঁসি দেওয়া উচিত। পত্রিকায় এটুকুই পড়েছি। কোন্ যুক্তিতে তিনি এ দাবি করলেন তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

আমার ধারণা, এ দাবির পেছনে যুক্তি হলো যে, সেনাপ্রধান হিসেবে দেশের প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনে সেনাপ্রধান ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরই অধীনস্ত

কতক সেনা কর্মকর্তা কেমন করে এ হত্যাকাণ্ড চালানোর পরিকল্পনা করল যে, তা তিনি টেরই পেলেন না। এরপর আরো বড় অপরাধ হলো যে, সেনাপ্রধান হয়ে হত্যাকারীদের অপরাধকে অনুমোদন দিয়ে তাদের মনোনীত রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেন।

আওয়ামী লীগের বর্তমান নেতৃবৃন্দ মজিব হত্যার সময়ও দলীয় নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৯৬ সালে তারা ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মজিব হত্যার পর ৩০ বছর পর্যন্ত হত্যাকারীদের বিচারের দাবি জানালেন না কেন? তারা ১৯৭৯ সালে নির্বাচিত ২য় জাতীয় সংসদ, ১৯৮৬ সালে নির্বাচিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ এবং ১৯৯১ সালে নির্বাচিত ৫ম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেন। এ দীর্ঘ সময়ে কি তারা ১৫ আগস্টকে শোক দিবস হিসেবে পালন করার দাবিতে সোচ্চার ছিলেন? ১৯৯৬-এর নির্বাচনী প্রচারাভিযানেও তারা এ দাবিকে ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করেননি। তাহলে তারা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর হঠাৎ এ বিষয়ে কেন এত সিরিয়াস হলেন? ৩০ বছরে নতুন প্রজন্ম যুবকে পরিণত হওয়ার পর তারা এ ইস্যুটি আবিষ্কার করেন।

৩৩৯.

জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি

শেখ হাসিনার দুঃশাসনামলে জাতীয় পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি মারাত্মক কুকর্মটি হলো 'জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি'। কোনো জাতীয় নেতাই এ জাতীয় কুকর্ম করেন না।

মজবুত আইন-শৃঙ্খলা বহাল রেখে জনগণের জান-মাল-ইজ্জতের হেফাজত করা যেমন সরকারের প্রধান দায়িত্ব, তেমনি সমাজে শান্তিময় পরিবেশ কায়েম করে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি নির্মাণ করা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য। শেখ হাসিনা আইন-শৃঙ্খলা ধ্বংস করার সাথে সাথে জাতীয় ঐক্যকেও চরমভাবে বিনষ্ট করেছেন। উৎপাদনের গতি অব্যাহত রাখা এবং সকল দিক দিয়ে দেশকে গড়ে তোলার জন্য জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি। দেশ গড়ার কাজে জনগণের সর্বমহলের সহযোগিতা সরকারের বিশেষ প্রয়োজন। জনগণের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি ছাড়া এ প্রয়োজন কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না।

এ কারণেই দেখা যায়, সব দেশে, সব কালেই যেসব জাতীয় নেতা সত্যিকার আন্তরিকতা নিয়ে দেশ গড়ার চেষ্টা করেছেন তারা ক্ষমতা গ্রহণের পর অতীতের সকল ভেদাভেদ, বিদ্বেষ, লড়াই ইত্যাদি ভুলে সবাইকে আপন করে নেওয়ার

উদ্দেশ্যে জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছেন। নিম্নে এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

১. হিজরী অষ্টম সালের রমযান মাসে রাসূল (স) বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করার পর দীর্ঘ ২১ বছর যারা চরম দুশমনি করেছে তাদেরকেও ক্ষমা করে দিলেন। দুশমনদের প্রধান নেতা আবূ সুফিয়ানও রাসূল (স)-এর প্রতি ঈমান এনে ক্ষমার প্রতিদান দিলেন। জনগণও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করল। বিরোধীদের শাস্তি দিতে চাইলে তিনি তাতে সক্ষম হতেন। তাদের হৃদয় জয় করে যে মহা সাফল্য অর্জন করলেন তা শাস্তির মাধ্যমে কখনও সম্ভব হতো না। তিনি এমন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন, যা চিরকাল বিজয়ীদেরকে পথ দেখাচ্ছে।

২. ১৯৪০-এর দশকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক সংঘাতময় বিরোধের ফলে গোটা উপমহাদেশে জনগণের মধ্যে চরম উত্তেজনা ও বিভেদ সৃষ্টি হলো। '৪৭-এর ১৪ আগস্ট ইংরেজ ও কংগ্রেসের সম্মতির ফলে ১০ কোটি মুসলমানের প্রাণের দাবি স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১১ সেপ্টেম্বর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব অনুভব করে ঐতিহাসিক ঘোষণা দিলেন। তিনি বললেন যে, পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলিম ও অন্য সবাই এখন এক জাতিতে পরিণত হয়েছে। আমরা সবাই পাকিস্তানি জাতি।

কংগ্রেস নেতা কামিনী কুমার দত্ত মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আইনমন্ত্রী হলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থমন্ত্রী হয়ে অতীতের বিভেদ ভুলে গেলেন। বিভক্ত ভারতে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ বন্ধ করার জন্য মিঃ গান্ধী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের অপরাধে নাথুরাম গডশে নামক এক উগ্র হিন্দুবাদী তাকে হত্যা করে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু যদি কায়েদে আযমের মত হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ডাক দিতে সক্ষম হতেন তাহলে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা এভাবে অব্যাহত থাকত না। ভারতে মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা অবিরাম চলতে থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানে তেমন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। শেরে বাংলা ফজলুল হক ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপক হয়েও শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নির্বাচন করলেন। মুসলিম লীগ থেকে ১৯৪৩ সালেই তিনি বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে শেরে বাংলা এর চরম বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তাঁকে পাকিস্তানের স্থায়ী দুশমন মনে করা হয়নি।